গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৯ - ২৫ জুন ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মায়ানমারে ভারতীয় সেনা অভিযান কোন উদ্দেশ্যে

৯ জুন শেষ রাতে মায়ানমারের (পূর্বেকার বার্মা) সীমানা পেরিয়ে সে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত এন এস সি এন-খাপলাং গোষ্ঠীর (ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড) শিবিরে ভারতীয় সেনাবহিনী আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে। ৪ জুন মণিপুরে ভারতীয় সেনা কনভয়ে জঙ্গি আক্রমণে ১৮ জন সেনার মৃত্যুর বদলা নিতেই এই অভিযান বলে সেনাবাহিনীর দাবি। এই অভিযান এবং তা নিয়ে বিজেপির মন্ত্রীদের 'ছাপ্পান্ন ইঞ্চি' বুকের ছাতি চাপড়ানো দেখে এ দেশের তো বটেই, বিশ্বের নানা দেশের বিশেষত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই অভিযান নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক খবরেরও শেষ নেই। কখনও অভিযানে বীর রসের জোগান বাড়াতে সরকার বা সেনাবাহিনী মৃতের সংখ্যা ৩৮ থেকে শুরু করে ১০০ পর্যন্ত বলেছে। শিকারি যেমন শৌর্যের প্রতীক হিসাবে অস্ত্র হাতে ছবি তোলে, এখানে তেমন সেনা অভিযানে ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের সামনে সেনাদের ছবি তুলে তাদের শৌর্যের গরিমা দেখানো হয়েছে, আবার পরদেশের সীমানা লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর সে ছবির দায় ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে ভারত সরকার। প্রথমে বলা হয়েছিল মায়ানমার সরকারের সঙ্গে কথার ভিত্তিতেই এই অভিযান হয়েছে। কিন্তু সে দেশের সরকার এমন কোনও কথা হয়েছে বলে অস্বীকার করে বলেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেদের সীমান্তের ভিতরেই অভিযান চালিয়েছে।

ভারতীয় সেনার এই অভিযানের সংবাদ প্রচার হতেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকল। ভারত সরকারের তরফে দু'টি পরস্পরবিরোধী বিবৃতি এল। একদিকে বলা হল, এই অভিযান সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত মতোই হয়েছে। অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ 'জাতীয়তাবাদী' মন্ত্রী মহোদয় বুক চাপড়িয়ে বললেন, দেখো, নরেন্দ্র মোদির বুকের পাটা কত শক্ত, অপর দেশে সেনা পাঠিয়ে বদলা নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। পরিষ্কার হয়ে গেল, এই অভিযান ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত মতোই হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, এ ধরনের সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীর একার পক্ষে নেওয়া ও তা কার্যকর করা অসম্ভব।

দ্বিতীয় দিকটি আরও মারাত্মক। মন্ত্রীরা বললেন, এই সেনা অভিযান মায়ানমারে চালানো হলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হল অন্য রাষ্ট্রদের। কখনও বলা হল চীন, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে এল পাকিস্তানের নাম। স্বভাবতই পাকিস্তান সরকারও গরম গরম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে যেসব খেলোয়াড়রা এখন মাঠের বাইরে রয়েছেন, তাঁরাও সুযোগ ছাড়লেন না, পাকিস্তানের সেনার বীরত্বগাথা গেয়ে উঠলেন। সকলেই জানেন, ভারতের পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে বুর্জোয়া দলগুলির কাছে যেমন 'পাকিস্তান বিরোধিতা' বা 'পাকবিরোধী জিগির' একটি বড় হাতিয়ার, পাকিস্তানের বুর্জোয়া দলগুলি ও ক্ষমতাশালী পাক সেনাবাহিনীর হাতেও তেমন ভারতবিরোধী জিগির একটি মোক্ষম অস্ত্র। কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের কাজে লাগায় ভারতের অভ্যন্তরে হানাদারি চালাতে, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাতে — এ

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়া হল ৫৮ লক্ষ গণস্বাক্ষরিত দাবিপত্র

জনজীবনের ১৮ দফা দাবিতে গত দু'মাস ধরে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র ১৫ জুন রাজ্যপালের কাছে জমা দিল এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। চাষির জমি লুঠের দানবীয় কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধ সহ জিনিসপত্রের দাম কমানো, নারীর নিরাপত্তা, পাশ-ফেল চালু প্রভৃতি দাবিতে তীব্র দাবদাহ মাথায় নিয়ে দলীয় কর্মী- সমর্থকরা সারা রাজ্যে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। মানুষও জীবন যন্ত্রণায় জেরবার হয়ে সামান্য স্বস্তি পাওয়ার আশায় আবেগের সাথে স্বাক্ষর দিয়েছেন। অনেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেও দিয়েছেন। মোট ৫৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৭৮টি স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র নিয়ে এদিন এক সুসজ্জিত ট্যাবলো রাজভবনে পৌঁছায় এবং সেগুলি রাজ্যপালের দপ্তরে পেশ করা হয়। রাজ্যপাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁর মাধ্যমেই রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত দাবিগুলি রাজ্য সরকারকে জানানো হয়। একইভাবে কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত দাবিগুলি জানানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। এবার দেখা যাক, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দাবির প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার কতটুকু মর্যাদা প্রদর্শন করে।

দাবিপত্র রাজ্যপালের কাছে পেশ করার আগে দলের রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮ দফা দাবি নিয়ে আমাদের দল কলকাতায় ৩০ হাজার মানুষের আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সেই আইন

চারের পাতায় দেখুন

স্বাক্ষরিত দাবিপত্র বোঝাই গাড়ি এগিয়ে চলেছে রাজভবনের দিকে

২ সেপ্টেম্বর দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

এগারোটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ২৬ মে শ্রমিক-কর্মচারীদের দশ দফা দাবির সমর্থনে এবং মালিকদের স্বার্থে শ্রমআইন পরিবর্তনের চেষ্টার বিরুদ্ধে দিল্লির মবলঙ্কর হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। কনভেনশনে বি এম এস, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, সি আই টি ইউ সহ এগারোটি দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকেই ২ সেপ্টেম্বর দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

কনভেনশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকারের কাছে যে দাবিপত্র পেশ করা হয়েছিল, সেই একই

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

দাবিপত্র আবার বিজেপি সরকারের কাছে রাখা হয়েছে। আপনারা জানেন এবং সমগ্র দেশ জানে এই দাবিগুলি পুরোপুরি ন্যায্য। এ সত্য মনমোহন সিং-এর সরকার অস্বীকার করতে পারেনি। বর্তমান বিজেপি সরকারও গায়ের জোর ছাড়া তাকে অস্বীকার করতে পারবে না। দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও সরকার তা মানছে না কেন?

এক বছর হতে চলল নরেন্দ্র মোদির সরকার চলছে। আমাদের ন্যায্য দাবিগুলি গ্রহণ করা দূরের কথা, এ সরকার তথাকথিত

দুয়ের পাতায় দেখুন

মায়ানমারে ভারতীয় সেনা অভিযান

একের পাতার পর

কথা এখন আর গোপন নেই। আবার পাকিস্তানের অভিযোগ, ওদের উত্তর সীমান্তে বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষত বালুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পিছনে ভারত সরকারের মদত রয়েছে। ফলে মায়ানমারের ঘটনা নিয়ে দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারত-পাক বিরোধের চরিত্র ও ইতিহাস দুই দেশের শাসক ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের কৃতকর্মে এমনই দাঁড়িয়েছে যে, তার আড়ালে অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চাপা দেওয়া সহজ।

এক্ষেত্রেও যে গুরুতর প্রশ্নটি চাপা দেওয়া হল, তা হচ্ছে, এভাবে কোনও দেশ তার সামরিক শক্তির জোরে অন্য দেশের সীমানা ডিঙিয়ে ও সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে নিজ সেনাবাহিনী ঢুকিয়ে দিতে বা অভিযান চালাতে পারে কি? এ কাজ কি নৈতিক? আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন কি এ ধরনের অভিযান অনুমোদন করে? ভারত সরকারের বক্তব্য, মায়ানমার সরকারের সম্মতির ভিত্তিতেই এ কাজ করা হয়েছে। অভিযানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর কিন্তু মায়ানমার সরকার বলেছে, ভারতীয় সেনার অভিযান ভারতীয় সীমানার ভিতরেই ঘটেছে। অর্থাৎ ভারতীয় সেনা মায়ানমারের সীমানা লঙ্ঘন করেনি। হয়তো গোপন সমঝোতা ফাঁস হওয়াতেই মায়ানমার সরকারকে এখন দায় অস্বীকার করতে হচ্ছে। আবার মায়ানমার সরকার যদি তার দেশের অভ্যন্তরে সেনা অভিযান চালাবার অনুমতি ভারতকে দিয়েও থাকে, তবে তা আনন্দের সাথে খুশি মনে দিয়েছে, নাকি পরাক্রমী ভারতের ভয়ে দিয়েছে — সেটাও এই মুহূর্তে জানার উপায় নেই। সেজন্যই বোধহয়, বিজেপি মন্ত্রীরা বুক বাজানো শুরু করায় কিছু বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম তাদের 'নির্বোধ' আখ্যা দিয়ে 'চুপ' থাকবার পরামর্শ দিয়েছে।

সর্বশেষ ও মূল প্রশ্ন — অপর দেশের সীমানা ডিঙিয়ে এই ভারতীয় সেনা অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ওই বিশেষ জঙ্গি গোষ্ঠীকে দমন করাই ছিল? ঘটনাপ্রবাহ এবং মন্ত্রীদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু বলে, জঙ্গি দমন ছিল অজুহাত বা বড়জোর গৌণ উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পরাক্রম দেখানো, যার সাথে আপনা আপনিই যুক্ত হয়ে যাবে বর্তমান সরকারে আসীন বিজেপি-আর এস এস চক্রের নিজস্ব 'শক্তি ও সাহস'-এর কীর্তিগাথা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্য দেশে ঢুকে সামরিক অভিযানের গৌরবের ছটায় শেষপর্যন্ত তো প্রধানমন্ত্রীর আসনই আলোকিত হবে। অবশ্য সেজন্য অপেক্ষা করেননি বিজেপি-র নেতা-মন্ত্রীরা, নিজেরাই সাত তাড়াতাড়ি ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তো সাম্রাজ্যবাদী ভারতের আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। নেপালে ভূকম্প পরবর্তী ত্রাণকাজে ভারতীয় সেনার ভূমিকায় নেপাল সরকারের ক্ষোভ ও ভারতীয় সেনাদের নেপাল ত্যাগ করার ফরমান জারি তো অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। শ্রীলঙ্কার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষেকে পরাস্ত করার জন্য বিরোধী দলগুলিকে মদত দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্তারা, এই অভিযোগ প্রকাশ্যে করেছেন পরাজিত রাজাপক্ষে। আর পাকিস্তান? সেজন্য মায়ানমার যাওয়ার দরকার কী? কাশ্মীরে কিছু একটা সমস্যা খুঁচিয়ে দিলেই তো হত। ফলে মায়ানমারে গিয়ে ভারতীয় সেনার পরাক্রম দেখানোর তেমন জরুরি প্রয়োজন ছিল না।

অতএব এ কথা বলাই যাই যে, ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ অবস্থাই সম্ভবত এই অভিযান চালাতে শাসক দলকে প্রণোদিত করেছে। দেশের মানুষের জন্য 'আচ্ছে দিন'-এর প্রবক্তা মোদি-অমিত-মোহন ভাগবতদের এখন 'বুরা দিন' চলছে। তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফানুস ফেটেছে। তাই 'হিন্দুত্ব'র গৌরবগানের পাশাপাশি 'হিন্দু জাতীয়তা'র পেশি শক্তি প্রদর্শন করার এত তাগিদ। ভারতের শিল্প-কৃষি পরিষেবা বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির জন্য অবাধে খুলে দেওয়ার পর বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির সেবাদাস দলের হাতে, তুলনায় দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি সামরিক হুমকি দেওয়া ছাড়া 'দেশপ্রেম' ও 'জাতীয়তাবাদে'র ঘন্টা বাজাবার অন্য উপায় আর কি ই বা আছে! মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি সহ হাজারো সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত দেশের মানুষকে ভুলাবার জন্য 'জাতি দম্ভ'-এর আস্ফালন সবচেয়ে ফলদায়ী যাদুদণ্ড! তবে ভারতের জনগণ মোদি-অমিত-ভাগবত চক্রের এই যাদুদণ্ডের ঘূর্ণিতে ভুলবেন কি না, সেটাই দেখার।

যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

একের পাতার পর

সংস্কার বা বিকাশের নামে আরও কালা কানুন আনতে যাচ্ছে। সংস্কার বলতে সাধারণত সমৃদ্ধি বা উন্নতিসাধন বোঝায়। কিন্তু এখানে তা একেবারেই নয়। 'সংস্কার'-এর নামে সরকারের উদ্দেশ্য শ্রম আইনকে লঘু ও বিকৃত করে দেওয়া। শিল্পবিরোধ আইন, ফ্যাক্টরি আইন বাতিল করা, এমনকী কলে-কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা ও কাজের পরিবেশ কেমন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য 'ইনসপেকশন'-এর যে আইন ছিল, তাকেও বিলোপ করা। একে 'ইনসপেক্টর রাজ' নাম দিয়ে মালিক-পুঁজিপতি শ্রেণি বহুকাল ধরেই এই আইনের বিলোপ দাবি করে আসছে। বর্তমান সরকার মালিক শ্রেণির সেই ইচ্ছা পূরণে তৎপর হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে। এই হল পরিস্থিতি।

যেসব দাবি আমরা তুলেছি, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, আপনারা সেগুলি ভালই জানেন। আমি একটু গভীরে গিয়ে বলতে চাই কেন সরকার শ্রমজীবী জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নিচ্ছে না? কেন সরকারকে দিয়ে এগুলি মানানো খুব কঠিন হবে? আমরা যতক্ষণ না রোগের কারণ জানতে পারব, রোগীকে রক্ষা করতে পারব না। এখানে মূল রোগটা রয়েছে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতির মধ্যেই। চাকরি সম্পর্কে ধারণাই যে সম্পূর্ণ বদলে গেল, তার উৎস রয়েছে ওখানেই। পূর্বে নিয়ম ছিল— আপনি চাকরি পেলেন, স্থায়ী হলেন, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির ও প্রোমোশন পাওয়ার অধিকারী হলেন, তারপর অবসর নেওয়ার সময় পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ড ফান্ড ইত্যাদির সুবিধা পেলেন। এখন ওসবকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী সকল চাকরিই হবে চুক্তিভিত্তিক। এটা কংগ্রেস সরকারই চালু করেছে। এখন মোদিও সেই রাস্তাই অনুসরণ করছেন। বিশ্বায়নের পথেই আরও দুটি নীতি আনা হয়েছে— উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ। উদারিকরণ মানে হল অবাধে বিদেশি পুঁজি আমাদের দেশে ঢুকবে, এ দেশের জনগণকে শোষণ করবে। এফ ডি আই বা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দরজা কেবল রেলওয়ে এবং বিমা ক্ষেত্রেই খোলা হচ্ছে তা নয়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও খোলা হচ্ছে। বেসরকারি করণের অর্থ হল ভারতের জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় যেসব রাষ্ট্রীয় শিল্প ও সংস্থা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর মালিকানা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। অটল বিহারি বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে অরুণ শৌরির মন্ত্রীত্বে একটা বিলগ্নিকরণ মন্ত্রকই তৈরি করা হয়, যার কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

কংগ্রেসের নরসিমা রাও যখন প্রধানমন্ত্রী ও মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী তখনই আমাদের দেশে বিশ্বায়নের নীতি চালু হয়। তারপর বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রীত্ব এসেছে, যুক্তফ্রন্টের সরকার হয়েছে, তারপর কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে মনমোহন সিং ১০ বছর সরকার চালিয়েছেন। এখন নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার। সরকার পাল্টেছে, কিন্তু বিশ্বায়নের নীতি পাল্টায়নি। তা হলে কি আমরা বলতে পারি যে, এটা কংগ্রেসের, কিংবা বিজেপির বা যুক্তফ্রন্টের নীতি? না তা বলা যায় না। এ হল শাসকশ্রেণির তথা পুঁজিপতিশ্রেণির নীতি। টাটা-বিড়লা-আম্বানি-আদানি-গোয়েঙ্কাদের নীতি। তাদের হুকুমেই সরকার এই নীতি কার্যকর করে আসছে। সরকার যদি ওদের হুকুম না মানে, তবে তারা সরকার পাল্টে দেবে। এটাই বাস্তব, আমরা যখন আন্দোলন করতে চাইছি, তখন এই বাস্তবটা আমাদের বোঝা দরকার।

যতক্ষণ না আমরা ঐ মূল নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছি, ততক্ষণ একটি-দু'টি দাবি হয়ত সরকার মেনে নিতেও পারে, কিন্তু শ্রমজীবী জনগণের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না, তা হতে পারে না। সুতরাং, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের মূল নীতিগুলির বিরুদ্ধে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ করা হচ্ছে। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসাকেন্দ্র হাসপাতালকে ব্যবসা করার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে মুনাফালোভীদের হাতে। এমনকী জল, যা ভারতের মতো নদী সমৃদ্ধদেশে সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তা পর্যন্ত ব্যবসার জন্য পুঁজিপতিদের দেওয়া হচ্ছে। পানীয় জলও কিনে খেতে হবে। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা।

আমি আর সময় নেব না। মূল কথাটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন ও তার উপযোগী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, তা হলে সেটা হবে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন। এ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলে এবং সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে এই জনবিরোধী নীতিগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমি বিশ্বাস করি, এ রকম ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ার পথেই আপনারা এগিয়ে আসবেন।

জীবনাবসান

হাওড়া শহরের পার্টির আবেদনকারী সদস্য কমরেড অসীম কাঁড়ার ৬ জুন নয়াদিল্লি স্টেশনে আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

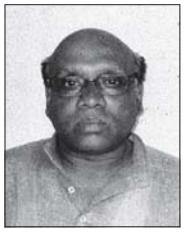

কমরেড অসীম কাঁড়ার ১৯৭৫ সালে বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি ৮০-র দশকের ঐতিহাসিক ভাষা শিক্ষা আন্দোলনের কর্মী হিসাবে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী হিসাবে পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নেন ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রামী সংগঠন 'ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম' গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। হাওড়া শহরে তথা জেলায় তিনি ছিলেন এর অন্যতম সংগঠক।

তাঁর পৈত্রিক বাসস্থানে দলের সর্বক্ষণের কর্মীদের বসবাসের জন্য একটি সেন্টার গড়ে তোলার তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তৎকালীন শাসক দলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা সেন্টারের কর্মীরা আক্রান্ত হলে কমরেড কাঁড়ার সাহসের সাথে তাদের পাশে দাঁড়ান। শেষ ২-৩ বছর তিনি হাঁপানি ও ফুসফুসের রোগে অসুস্থ ছিলেন।

৭ জুন দিল্লিতে আত্মীয়-স্বজন, ব্যাঙ্ককর্মীরা ও দিল্লির কর্মীদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২০ জুন হাওড়ায় কমরেড অসীম কাঁড়ারের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড অসীম কাঁড়ার
লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদে কমসোমলের কর্মশালা

২০ মে মুর্শিদাবাদ জেলা কমসোমলের উদ্যোগে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে ওয়াই এম এ মাঠে প্যারেড, পিটি শেখানো হয়। তারপর ধোপঘাটি বিজ্ঞান মঞ্চের হলে কিশোর-কিশোরীদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান ক্যারাটে শিক্ষক সাধু চক্রবর্তী।

কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ দেহ ও চিন্তার বিকাশের প্রয়োজনে, সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যারাটে শো, তাৎক্ষণিক নাটক, বক্তৃতা ও আলোচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য খাদিজা বানু এবং কমসোমলের রাজ্য নেত্রী শম্পা সিরিন।

উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য আবু রাইহান বিশ্বাস, জেলা কমসোমলের পক্ষে অঞ্জনা খাতুন।

সেনাবাহিনীর ছররা গুলিতে চোখ হারাল কাশ্মীরের স্কুলছাত্র

হামিদ নাজির ভাট। কাশ্মীরের বারামুলার দশম শ্রেণির ছাত্র। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ডান চোখের দৃষ্টি হারাল। চোখে, মুখে অসংখ্য আঘাত নিয়ে এখন ভর্তি স্থানীয় এক হাসপাতালে। সেনাবাহিনীর ছররা বন্দুকের শতাধিক ছোট ছোট লোহার বল তার মাথার খুলি ফুটো করে দিয়েছে, চোয়াল, ঠোঁট, নাক ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

২১ মে উত্তর কাশ্মীরের পলহলান গ্রামে বনধের মধ্যে টিউশন পড়তে গিয়ে সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয় হামিদ। কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর ভয়ঙ্কর অত্যাচার, জঙ্গি সন্দেহে যুবকদের ধরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা, সন্ত্রাসবাদী অজুহাতে খেলতে থাকা কিশোরদের উপর গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা— এগুলি কাশ্মীরে আকছার ঘটছে। এখন ব্যবহার হচ্ছে 'পেলেট গান' যার থেকে একটা বুলেট নয়, অসংখ্য লোহার বল ক্ষতবিক্ষত করে দেয় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে। চিকিৎসকরা আঘাতের তীব্রতা দেখে বলছেন, মাত্র ২-৩ ফুট দূর থেকে মাথা, মুখ লক্ষ করে ছররা বুলেট না ছুঁড়লে এমন সাংঘাতিক আঘাত সম্ভব নয়। পুলিশের বয়ান, হামিদ প্রতিবাদ মিছিলে ছিল এবং পাথর ছুড়ছিল। চিকিৎসকরাই তা নস্যাৎ করে দিয়ে বলছেন, তাহলে এত কাছ থেকে গুলি লাগতে পারে না। যে জনতা পাথর ছুঁড়ছে, পুলিশ তার উদ্দেশ্যে দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে। পুলিশের বক্তব্য, তারা এখন কাশ্মীরে বিক্ষোভ দমাতে এমন অস্ত্র ব্যবহার করছে যাতে প্রাণহানি না হয়। তার জন্যই নাকি ছররা বুলেটের আমদানি। শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওয়াসিম রশিদ 'দ্য হিন্দু'র সাংবাদিককে জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে এই ছররা বুলেটের আঘাত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। অসংখ্য মানুষ এই বুলেটের আঘাত নিয়ে হাসপাতালে আসছে। আগে কোনও বিক্ষোভে এত আহত হত না। এর ফলে কত মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে তার কোনও রেকর্ড নেই। ডাঃ ওয়াসিম রশিদের মতে, শুধু তাঁদের হাসপাতালেই এই সংখ্যা ৭০০-র বেশি। যাদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জনেরই দু'টি বা একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীনগরের এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শেখ সাজাদ পত্রিকাটির সাংবাদিককে বলেছেন, মৃত্যুর চেয়েও এ আঘাত কোনও অংশে কম নয়। কারণ, আহতদের অঙ্গহানি হয়ে জীবন পুরোপুরি ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

মারাত্মক আহত হামিদ নাজির ভাট

কেন এত সাংঘাতিক পরিণাম হচ্ছে? প্রথমত, চিকিৎসকরা বলছেন বেশিরভাগ আহতই আঘাত পাচ্ছেন ৫ ফুটের মধ্যে থেকে ছোঁড়া বুলেটে। যার অর্থ প্রতিবাদ মিছিল ঠেকাতে গুলি চালানোর গল্পটা সাজানো। পুলিশ আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য, বেশি মানুষকে আহত করতেই গুলি ছুঁড়ছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ সরাসরি মুখ লক্ষ করে ছররা গুলি ছুঁড়ছে। তাই আঘাতের পরিণাম এত মারাত্মক হচ্ছে।

এক হাসপাতাল কর্তার কথায়, আমাদের রোগীরা চোখে বেঁধা ছররা এবং ক্ষতস্থানের পুঁজ নিয়েই হাসপাতাল ছেড়ে পালায়। কারা ছররার আহত হয়েছে পুলিশের চর হাসপাতালে এসে তাদের নাম লিখে নিয়ে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করে।

বিজেপি-পিডিপি জোট সরকারে বসেই বিপর্যস্ত ভূ-স্বর্গকে আরও নরকে পরিণত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতি নয়, সরকার চলছে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বিদ্বেষের মন নিয়ে, যা কাশ্মীর সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বোঝা যায়, কি কেন্দ্র কি রাজ্য সরকার কেউই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আদৌ চায় না। হামিদের মতো অসংখ্য ছাত্র জীবন দিয়ে যার মূল্য চোকাচ্ছে, যারা অন্যদের মতো পৃথিবীটাকে আর দেখতে পারবে না দু'চোখ মেলে। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েই উপত্যকার মানুষ প্রতিকার খুঁজছেন।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা পরিণামে ছাত্রের অকালমৃত্যু

দিল্লির ত্রিলোকপুরীর ছাত্র গৌরবের আত্মহত্যা সরকারের পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতিকে যেন কাঠগড়ায় তুলে দিয়ে গেল। ক্লাস নাইনে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিল সে। ফেল করার গ্লানি ভুলতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

গৌরবের স্কুলের এক শিক্ষকের কথায়, ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ফলে বিনা বাধায় পাশ করে যাওয়ার কারণে ছাত্ররা ভালো করে পড়াশোনায় নজর দেয় না। ফলে ক্লাস নাইনে প্রচুর ছাত্র ফেল করে। গত বছরে ঐ স্কুলেই ২২৪ জনের মধ্যে ১৪৫ জন মাত্র পাশ করেছিল। জানা গেছে, এ বছর দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিতে নাইনে ৭০ শতাংশ ছাত্র ফেল করেছে। কোনও কোনও স্কুলে ৯০ শতাংশ ফেল করেছে। সমস্যার গভীরতা বোঝার জন্য এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট।

গৌরবের বাবার কথায়, বইপত্র কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না আমার। গৌরব বন্ধুদের থেকে জোগাড় করে পড়ত। ফলে সিলেবাস ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেনি। এইট পর্যন্ত পাশ করে হঠাৎ নাইনে এসে ফেল করার গ্লানিই তাদের সন্তানের মৃত্যুর কারণ বলে মনে করছেন গৌরবের বাবা-মা। বাবা প্রতিবন্ধী। মা একমাত্র রোজগেরে, পরিচারিকার কাজ করে কোনওমতে সংসার চালান।

কেন্দ্রীয় সরকার ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার আইন পাশ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার তা কার্যকর করছে। এর গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' পদ্ধতি। তারপর 'নিরবচ্ছিন্নভাবে' পাশ করে আসা ছাত্ররা নাইনে এসে ফেল করে বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের সামনে আসতে গ্লানিবোধ করে। পরিণামে কেউ কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়— আত্মহত্যা। শুধু পাশ-ফেল তুলে দেওয়াই নয়, স্কুলগুলির পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব। ক্লাসে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক নেই। বহু ছাত্রের বাবা-মা গৌরবের বাবা-মায়ের মতো অশিক্ষিত। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ভালো করে ক্লাস হয় না। ফলে বহু ছাত্রই স্কুল কামাই করে বা অমনোযোগী হয়ে ক্লাস করে। ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বা রেজাল্টের জন্য বাবা-মায়েরা শিক্ষকদের মুখ চেয়ে থাকেন। তারপর যখন সরকারি শিক্ষানীতির পরিণামে সন্তানের মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে হয় তাঁদের, তা কত মর্মান্তিক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শিক্ষক মহল, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে বারবার সরকারি এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেলেও কি রাজ্য কি কেন্দ্র সরকার কেউই কর্ণপাত করেনি। রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক থেকেও অবিলম্বে পাশ-ফেল চালু করার দাবি তোলা হয়েছে। আজ গৌরব, কাল আর কোনও ছাত্র যদি পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার কারণে অকালমৃত্যুর শিকার হয় সরকারকেই তার দায় নিতে হবে। একদিকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অপরদিকে শিক্ষার সর্বনাশ— এই দুই আক্রমণকে রুখতে আজ অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে, সোচ্চার হতে হবে। শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে পারলেই একমাত্র সরকারের এই সর্বনাশ প্রতিহত করা সম্ভব।

পাশ করা ছাত্রদের ভর্তির দাবিতে শিলচরে আন্দোলন

মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রত্যেক পড়ুয়ার পরবর্তী শিক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনীহার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ১-৭ জুন আসাম রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে। এরই অঙ্গ হিসাবে ৬ জুন প্রতিবাদ দিবসে শিলচরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কলেজে শিফট ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিকে পরিণত করা, পড়ুয়াদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা অনুপাতে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করার দাবিতে এক স্মারকপত্র এ দিনের আন্দোলন থেকে জেলাশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়।

হরিহরপাড়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠককে হত্যা, গ্রেপ্তারের দাবিতে সর্বাত্মক বনধ

হরিহরপাড়া ৯ জুন ঃ হরিহরপাড়া রেজিস্ট্রি অফিস থেকে কাজ সেরে নিজের বাড়ি রামকৃষ্ণপুরে ফেরার পথে নৃশংসভাবে খুন হলেন পেশায় দলিল লেখক, বিহারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এস ইউ সি আই (সি) দলের দীর্ঘদিনের বলিষ্ঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রিয় সমাজসেবী কমরেড মসলেম বিশ্বাস (৬২) ও তাঁর একমাত্র পুত্র মনিরুজ্জামান (৩৩) বিশ্বাস (টিটু)।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ঊনসত্তরের শেষভাগে মুর্শিদাবাদের রামকৃষ্ণপুর বিহারিয়ায় একটি বীভৎস সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে। কিশোর মসলেমরা ছিল সেই দাঙ্গার শিকার। তৎকালীন এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃবৃন্দের দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা প্রভাবিত করেছিল মসলেম সহ রামকৃষ্ণপুর ও সংলগ্ন গ্রামগুলির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তরুণদের। সেই পটভূমিকায় সত্তরের মধ্যভাগে দলের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে মসলেমদের। রামকৃষ্ণপুর সহ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে গড়ে ওঠে এস ইউ সি আই (সি)-র শক্তিশালী সংগঠন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা বিভিন্ন রঙের জামা পাল্টিয়ে বিভিন্ন দলের ছত্রছায়ায় সেই সংগঠনের উপর আঘাত নামিয়ে নিয়ে এসেছে বারবার। কিন্তু মসলেম সহ অন্যদের সংগ্রামী ভূমিকায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে তাদের সেই প্রচেষ্টা। আজও সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত। যারই ফলশ্রুতিতে প্রাণ দিতে হল পিতা-পুত্রকে। এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাধন রায় ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের হত্যা করে গণআন্দোলনের শক্তিকে প্রতিহত করা যাবে না।

ওই দিন বিকেল ৫-৩০টা নাগাদ রুকুনপুর অঞ্চলের ঝাঁঝা গ্রাম পেরিয়ে মাঠের রাস্তার উপরে অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণপুরেরই বাসিন্দা আনসার মণ্ডল ওরফে মন্টু, তার ভাই এবং ৭-৮ জন ভাড়াটে খুনি। সামান্য ঝড়বৃষ্টির ফলে জনবিরল ফাঁকা মাঠে গুলি চালিয়ে তারা হত্যা করে কমরেড মসলেম ও তার পুত্রকে। গ্রামবাসীরা তখনই খোঁজ করতে গিয়ে দেখে মন্টুর পুরো পরিবার গ্রাম ছেড়ে পলাতক। অর্থাৎ মন্টু ও তার দলবল পরিকল্পনা করেই এই হত্যা করেছে। আপাত কারণ হিসাবে কিছুদিন আগে একটি সামাজিক বিবাদে উচ্ছৃংখল মন্টুর মার খাওয়ার ঘটনা থাকলেও এত বড় হত্যাকাণ্ডের জন্য মন্টুর পিছনে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক মদত না থেকে পারে না।

ঘটনা জানাজানি হতেই আশেপাশের গ্রাম থেকে জড়ো হতে থাকে হাজার হাজার গ্রামবাসী। ঐ দিন অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরিহরপাড়া বাজার সংলগ্ন রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ছুটে আসেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। পরদিন ১০ জুন সমগ্র হরিহরপাড়ায় বনধ পালিত হয়। সকলের মুখে একটাই আওয়াজ, ১৯৯২ সালের সেই কালো দিনগুলি আমরা কিছুতেই ফিরে আসতে দেব না।

পরদিন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। আগামী ১৮ জুন প্রয়াত কমরেড মসলেম বিশ্বাসের স্মরণ সভার অনুষ্ঠিত হয় এস ইউ সি আই (সি) হরিহরপাড়ার লোকাল কমিটিগুলির উদ্যোগে।

কমরেড মসলেম বিশ্বাস লাল সেলাম

ঋণগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ বর্ধমানে

বর্ধমান জেলায় বোরো ধানের উপযুক্ত দাম না পেয়ে ঋণের জ্বালায় আত্মঘাতী হয়েছেন ভাতারের ভাগচাষি সনাতন ধাড়া (৪৯) ও মেমারির যদু সরেন (৬২)। যদিও সরকার তার সেই ফাটা রেকর্ডটিই বাজিয়ে চলেছে 'পারিবারিক অশান্তিতে আত্মহত্যা'।

১ জুন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, ১৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে সরকারি উদ্যোগে চাষির কাছ থেকে ধান কেনা শুরু করা ও ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ঋণ মকুব করার জন্য সরকারি ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ জেলাশাসকের কাছে দাবি জানান, আত্মঘাতী চাষিদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাথে তাদের ঋণ শোধ করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী, বাপী কুণ্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জমি রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে হাওড়ার চাষিরা

'সার ফ্যাক্টরির জমি' নামে পরিচিত হাওড়া পৌরসভার সরকার অধিগৃহীত ৩৫০ বিঘা জমি জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। উত্তর আড়ুপাড়া ও সুভাষনগরের ৩৬টি পরিবার গত ২৮ বছর ধরে এই এলাকার ১০০ বিঘা জমির জঙ্গল সাফ করে সেখানে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এই এলাকায় ৩০টি পুকুর, ৩৭টি খেলার মাঠ আছে। সম্প্রতি 'হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' এই জমি কলকাতা পুলিশকে হস্তান্তর করেছে। তারপর থেকে এখানে পুলিশের আবাসন ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার নামে বাইরে থেকে মাটি এনে জমি-পুকুর ভরাট করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬টি পুকুর ভরাট করা হয়েছে এবং চাষিদের বহু ফসল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চাষবাস বন্ধ হয়ে গেছে। ফসল তোলার জন্য স্থানীয় বিধায়কের ২ মাস সময় দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার চাষিরা জমি ও ফসল রক্ষার দাবিতে গড়ে তুলেছে 'উত্তর আড়ুপাড়া ভূমিরক্ষা কমিটি'। কোনও ভাবেই চাষিকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না, বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করা এবং খেলার মাঠ দখল করা চলবে না — এই দাবিতে চাষিরা লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন। কমিটির পক্ষ থেকে ৩ জুন অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে চাষিরা ডেপুটেশন দিয়েছেন। তিনি সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

হিন্দুস্তান কেবলসে শ্রমিক কনভেনশন

হিন্দুস্তান কেবলসের পুনরুজ্জীবন, ১৪ মাসের বকেয়া বেতন, ২০০৭-এর ওয়েজ রিভিশন ইত্যাদি দাবিতে ৬ জুন হিন্দুস্তান কেবলস অফিসার্স ক্লাবের অডিটোরিয়ামে একটি শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আহ্বায়ক ছিল এ আই ইউ টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি এবং এইচ এম এস অনুমোদিত হিন্দুস্তান কেবলসের পাঁচটি ইউনিয়নের যুক্ত মোর্চা। কনভেনশনে এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা এবং বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য। অন্যান্য সংগঠনের বক্তারা বক্তব্য পেশ করেন।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ডি এস ও-র সম্মেলন

১৯ মে মেদিনীপুর শহরের উপেন্দ্র শম্ভুনাথ ভবনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা, শল্য চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার, ডাঃ সমীর মান্না, সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি কমরেড দীপক পাত্র প্রমুখ। এন আর আই কোটায় লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছাত্রভর্তির সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে ৭৫ শতাংশ আসন দরিদ্র মধ্যবিত্ত জয়েন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিনিয়ে আনার লড়াইয়ের ইতিহাস সহ, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠার পেছনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র ঐতিহাসিক আন্দোলন, মেডিকেল কলেজগুলিতে ডি এস ও-র ধারাবাহিক আন্দোলন ও দাবি আদায়ের কথা তুলে ধরেন ডাঃ দাশগুপ্ত। মেডিকেল এথিকসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান ও অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়। সম্মেলনে সেখ আব্দুল সাত্তারকে সভাপতি, বিশ্বজিৎ মান্নাকে সম্পাদক, সেখ লতিফকে কোষাধ্যক্ষ করে ১০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

কে কে এম এসের নেতৃত্বে দাবি আদায়

কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং ব্লকে একাধিক ক্যাম্প করে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ীতে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে ৩ জুন চলে পথ অবরোধ। ঐ দিন ব্লক অফিসে ধান পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা। সংগঠনের কেশিয়াড়ী ব্লকের নেতা কমরেড প্রদীপ দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বি ডি ও-কে স্মারকলিপি দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। আন্দোলনের চাপে বিডিও ৬ জুন কেশিয়াড়ী ব্লকের ৯ নং গগনেশ্বর অঞ্চলের কানপুর গ্রামে সরকারি সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টাল ১৩৬০ টাকা দামে ৩০০ কুইন্টাল ধান কেনেন। আগামী দিনে প্রতিটি অঞ্চলে ক্যাম্প করে ধান কেনার আশ্বাস দেন। প্রদীপ দাস আন্দোলনের জয়ে কৃষকদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করার দাবি জানান।

বিজেপির সুশাসন!
মহারাষ্ট্রে ঋণের জ্বালায় তিন মাসে ৬০১ জন কৃষকের আত্মহত্যা

বিজেপির সুশাসনের নমুনা! তিন মাসে ৬০১ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন মহারাষ্ট্রে।

কোনও বেসরকারি তথ্য নয়, খোদ সরকারি তথ্য বলছে, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ, মারাঠওয়াড়া সহ অন্যান্য জেলার ৬০১ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ঋণগ্রস্ত হয়ে। মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের দেওয়া তথ্যই বলছে, দিনে সাতজন করে কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। গত বছরেও খরার কারণে এবং অকাল বর্ষণে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় ঋণগ্রস্ত তুলাচাষিদের আত্মহত্যার মিছিল চলেছিল। এবছরও একই কারণে বিপুল সংখ্যক কৃষক আত্মঘাতী হতে বাধ্য হলেন। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি নিস্পৃহতা নিয়ে। সরকার মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকার খরা ত্রাণ ঘোষণা করেছে। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত ৯০ লাখ কৃষকের কাছে তা নামমাত্র।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ গো-হত্যা নিবারণে আইন করার জন্য মাতামাতি করছেন, যেন এটাই রাজ্যের মানুষের প্রধান সমস্যা। কিন্তু কৃষিপ্রধান রাজ্য মহারাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা কৃষির সংকট, তা খরা এবং অকালবৃষ্টির কারণে মার খাচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে ফসলের, কৃষক হচ্ছে ঋণগ্রস্ত, এগুলি সমাধানের কোনও চেষ্টা করেনি ফড়নবিশ সরকার। সরকারি কোনও সাহায্য পৌঁছয়নি অসহায় কৃষকদের কাছে। তা হলে এত কৃষকের অকালমৃত্যু হত না।

তুলাচাষে উৎকৃষ্ট মহারাষ্ট্রের জমি। তুলা (ক্র্যাশ ক্রপ) চাষ করে বহু পরিবারের দিন চলে। অতি বৃষ্টি বা খরা এই চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বছরের পর বছর কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না বা অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাতে কুইন্টাল প্রতি তুলার দাম ৬৮০০ টাকা হলে কৃষকরা ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে পারত, পরিবার চালাতে পারত কোনওরকমে। কিন্তু সরকার ৪০০০ টাকায় কুইন্টাল বেঁধে দিয়েছে। কৃষকদের বক্তব্য, খরা না হলেও কৃষকদের মরতে হত। এ রাজ্যের আলু বা ধানচাষিদের ক্ষেত্রে প্রতি বছর যে মৃত্যুমিছিল দেখা যায়, সেই একই চিত্র মহারাষ্ট্রে। রাজ্যে রাজ্যে এই মৃত্যুমিছিল কি চলতেই থাকবে?

জমা দেওয়া হল ৫৮ লক্ষ গণস্বাক্ষরিত দাবিপত্র

একের পাতার পর

অমান্যে রাজ্য সরকার পুলিশ ও র‍্যাফ নামিয়ে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করেছে, তাতে ৩০০ জন কর্মী আহত, ১০৭ জন কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। লাঠির আঘাতে উত্তম পাড়ই ও রমাকান্ত সরকার নামে দুই কর্মীর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। এই আন্দোলনকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি চালানো হয়।

তিনি বলেন, রাজ্যপালকে আমরা জানিয়ে আসব, যদি দ্রুত দাবিগুলি পূরণের ব্যবস্থা না হয়, তা হলে আগস্ট মাস জুড়ে জেলা-মহকুমা-ব্লক স্তরে বিক্ষোভ-

রাজভবনে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সাথে নেতৃবৃন্দ

আইন অমান্য-ধরনা ইত্যাদি নানা আন্দোলন চলবে। তাতেও যদি বধির সরকারের কানে জনতার দাবির আওয়াজ না পৌঁছায় তা হলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ রাজভবন অভিযান করা হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে দলের ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ২৬ আগস্ট কলকাতায় ছাত্র মহামিছিলের ডাক দিয়েছে। এ আই ডি এস ও-র অল ইন্ডিয়া কমিটি অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সাথে যৌথ ভাবে ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সারা ভারত ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ওই দিনই আমাদের শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রত্যেকটি আন্দোলন সফল করার জন্য তিনি কর্মী-সমর্থক ও জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

কমরেড বসু আরও বলেন, স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির মধ্যেও দলের কর্মীরা নেপাল ও ভারত সীমান্তে ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য কয়েকদিন ত্রাণ সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষ থেকে ভারত সীমান্তে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে। নেপালের অভ্যন্তরেও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওয়িস্ট)-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় বহু মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে দুর্গত মানুষদের চিকিৎসার্থে। সারা দেশে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৫ লক্ষ টাকা দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান ২১ মে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ইউ সি পি এন (মাওয়িস্ট)-এর চেয়ারম্যান কমরেড পুষ্প কমল দহল (প্রচণ্ড)-এর হাতে তুলে দেন। প্রতিবেশী দেশ নেপালের পাশে দাঁড়িয়ে এভাবে সাহায্যের জন্য তিনি দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনের পর কমরেড সৌমেন বসুর নেতৃত্বে নয় জনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্রগুলি পেশ করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, ছায়া মুখার্জী, তপন রায় চৌধুরী, স্বপন ঘোষ, প্রশান্ত ঘটক, মানব বেরা, স্বপন ঘোষাল এবং প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়

সাম্রাজ্যবাদী গেম প্ল্যান

অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক পিটার কোয়েনিগ কর্মসূত্রে সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৩০ বছর ধরে সেখানে কাজ করে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে মুনাফালোলুপ যুদ্ধবাজ কালাপাহাড়ি চরিত্র তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতার একটি ঝলক উঠে এসেছে তাঁর এই লেখাটিতে। লেখাটি ইন্টারনেট পত্রিকা আই সি এইচ সূত্রে প্রাপ্ত।

চরম নৈরাজ্যে ছারখার হয়ে যাওয়া দেশগুলোকে নাকি 'মুক্ত' করা হয়েছে! ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন — যেখানেই তাকান, দেখবেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের স্যাঙাতরা সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে 'মুক্ত' করার নামে, কিংবা স্বৈরাচারী শাসকদের হঠিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অজুহাতে যে দেশেই পা রেখেছে, সেই দেশকেই ভাসিয়ে দিয়েছে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায়, ডুবিয়ে দিয়েছে চরম নৈরাজ্যে। ভরিয়ে দিয়েছে অন্তহীন অরাজকতা, মৃত্যু ও দুর্দশায়। এবং আদায় করেছে নিঃশর্ত বশ্যতা।

এটাই হল চেনা ছক। উদ্দেশ্য স্পষ্ট — এক, স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশে হানাদারি চালিয়ে গোটা দেশের মানুষ ও তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পূর্ণ দখলদারি কায়েম করা। দুই, সেনাবাহিনীতে নিয়োগ ও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির ব্যবসা বাড়িয়ে তোলা (আমেরিকার জিডিপি-র ৫০ শতাংশই আসে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত শিল্প ও পরিষেবা থেকে)। তৃতীয় ও সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল, দেশগুলিকে এমনভাবে তছনছ করে দেওয়া যাতে সেগুলোকে নতুন করে গড়ে তুলতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন পড়ে এবং আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী মহাজনী সংস্থাগুলি সহজেই টাকা ধার দেওয়ার সুযোগ পায়। আক্রান্ত দেশের মধ্যেকার একচেটে পুঁজিপতি ও বৃহৎ ব্যবসাদাররা, প্রকৃত প্রস্তাবে যারা কিনা দেশের আসল শাসক, সাম্রাজ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে কলকাঠি নাড়ে। তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকার ও তার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীরা, জনসাধারণের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতারও ধারও যারা ধারে না, সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো শর্ত মেনে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ব্যয়সংকোচের বোঝা চাপিয়ে তাদের দুর্দশার অতলে ঠেলে দিয়ে ঋণের সেই টাকা দু'হাত ভরে লুফে নেয়।

এই খেলাই খেলে চলেছে সাম্রাজ্যবাদীরা — ইয়েমেন, ইউক্রেন, সিরিয়া, ইরাক, সুদান, মধ্য আফ্রিকা, লিবিয়া ... আরও কত কত দেশে। কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। শত্রু যে কেউ হতে পারে — আইএসআইএস, আল কায়েদা বা এরকম যে কোনও ভাড়াটে খুনিদের গোষ্ঠী, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের টাকাতেই লালিত-পালিত। আর আছে সৌদি আরব, বাহারিন সহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ এবং ব্রিটেন, ফ্রান্সের মতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর দেশগুলি।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট অল্যান্দে সম্প্রতি কাতারের সঙ্গে ২৪টি রাফালে যুদ্ধবিমান বিক্রির চুক্তি করেছেন। আরও জেট প্লেন সে দেশকে বিক্রি করার পরিকল্পনা আছে তাঁর। এ বেশ লাভজনক ব্যবসা। ফ্রান্সে তৈরি এই জেট প্লেনগুলি সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার নামে এলাকার পর এলাকা ছারখার করে দেবে। আরও মৃত্যু, আরও দুর্দশা, আরও দারিদ্র ডেকে আনবে। বাঁচতে চেয়ে অন্য দেশে পালাতে চাওয়া উদ্বাস্তুরা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় জাহাজডুবি হয়ে প্রাণ হারাবে। সৃষ্টি হবে আরও আরও নৈরাজ্য। ফল হিসাবে আক্রান্ত দেশের সাধারণ মানুষ স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, নিজের দেশের সম্পদের উপর নিজেদের মালিকানা কায়েমের দাবিতে লড়তে পারবে না, কারণ শুধুমাত্র নিজেদের প্রাণটুকু, সন্তান-সন্ততির জীবনটুকু রক্ষার চেষ্টাতেই তাদের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ তো এটাই চায়! প্রেসিডেন্ট অল্যান্দের মতো আরও যারা অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিমান ইত্যাদি দেশে দেশে বিক্রি করে তারা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, এসব অস্ত্র মানুষ মারতে, দেশ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হবে। এরপর এদের গণহত্যাকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? এরাই তো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতের যুদ্ধ-অপরাধী। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র অল্যান্দের মতো প্রেসিডেন্টরা এভাবেই মানুষ মারার ব্যবসা করে ভিক্টর হুগো, বালজাক, আলেকজান্ডার ডুমার মতো মনীষীদের মহান ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ফ্রান্সের অর্থনীতির উন্নতি ঘটাতে চান!

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্যাঙাতদের উদ্দেশ্য হল দেশে দেশে নৈরাজ্য, দুর্দশা সৃষ্টি করে জনসাধারণকে পদানত করে রাখা। যেহেতু মার্কিন সেনা ও ন্যাটোকে সব জায়গায় কাজে লাগানো ঠিক নয়, তাই সাম্রাজ্যবাদ ভাড়াটে খুনেদের কাজে লাগায়। আইএসআইএস, আল কায়েদার মতো সংগঠনগুলির পিছনে টাকার স্রোত বইয়ে দেয়। তাদের দিয়ে হত্যাকাণ্ড চালায়, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, যাতে এদের দমনের অজুহাতে শেষপর্যন্ত ন্যাটো ও পেন্টাগন এগিয়ে এসে ধ্বংসের বুলডোজার চালিয়ে দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবার সুযোগ পায়।

মূলধারার প্রচারমাধ্যম যদিও অন্য কথা প্রচার করে। তারা বিশ্বের মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় যে, ইয়েমেনে ক্ষমতা দখলের জন্য শিয়াপন্থী হুথি গোষ্ঠীর সঙ্গে সুন্নি গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। ইরান হুথিদের সাহায্য করছে, ফলে হুথিদের পদানত করতে হবে। যদিও সম্প্রতি হুথিদের ইরানের সাহায্য করার বিষয়টিকে মিথ্যা প্রচার বলে মন্তব্য করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের এক অফিসার। আসলে হুথিদের ইরান সাহায্য করছে এ কথা মানুষকে বিশ্বাস করানো গেলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা হয় ইরানের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে। এবং একবার হুথিদের হঠিয়ে দিতে পারলে ইয়েমেনে একটা পুতুল প্রেসিডেন্ট বসিয়ে দেওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আর কঠিন কাজ কী! তারপরেই চালানো যাবে অবাধ লুঠপাট। সেই কারণে বোমা বর্ষণ করে করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইয়েমেনের জনসাধারণকে দুর্দশার অতলে ঠেলে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য —রণকৌশলগত ও ব্যবসায়িক কারণে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডেন বন্দর ও উপসাগরীয় অঞ্চলগুলির মতো জায়গাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, যাতে পেট্রোলিয়ামের ব্যবসায় ঘাটতি না পড়ে।

ইউক্রেনেরও একই চিত্র। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, সেখানেও কি আইএসআইএস কিংবা আল কায়েদা-র মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে? হলফ করে বলা যায়, সেখানেও তারা আছে। তাদের ট্রেনিং দিচ্ছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং প্রায় ৬ হাজার মার্কিন সেনা। কিয়েভ শহরের সেনাদের তারা ট্রেনিং দিচ্ছে কত দ্রুততা এবং দক্ষতার সঙ্গে ডনবাসে তাদের স্বদেশবাসী ভাইদের তারা হত্যা করতে পারে। তাদের শেখানো হচ্ছে, কেমন করে ইউক্রেনে দীর্ঘস্থায়ী নৈরাজ্য সৃষ্টি করা যায়। যদি ইউক্রেনের সেনারা তাদের স্বদেশের ভাইদের মারতে না চায়, তাহলে কিয়েভের নয়া নাৎসিরা আছে, তাদের গুলি করে মারার জন্য।

ফলে, ইউক্রেনে আল কায়েদা বা আইএসআইএস আছে কি না, এটা কোনও প্রশ্নই নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা যেখানে চাইবে, সেখানেই তারা থাকবে। থাকতে তারা বাধ্য, কারণ এর জন্যই তাদের পিছনে টাকা ঢালে সাম্রাজ্যবাদ। তাদের মদতপুষ্ট প্রচারমাধ্যম আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার অবিরাম চেষ্টা চালায় যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শয়তান। তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের 'গণতান্ত্রিক' শাসকদের নাকি লড়াই করতেই হবে, কারণ ওরা পশ্চিমি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী, নয়া-উদারনীতিবাদী মুক্ত বাজারের নীতি-মূল্যবোধের নামে যা-খুশি করার যে রীতি, তার ওরা বিরোধী।

আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে সাধারণ মানুষ বাজারের পণ্য ছাড়া কিছুই নয়। এদের অবাধে কামান-বন্দুকের মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, জিন-পরিবর্তিত বিষাক্ত খাবার খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, ড্রোন অথবা বোমার হামলা চালিয়ে মেরে ফেলা যায়, কৃত্রিম ভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে দলকে দল পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা যায় এবং এইভাবে গোটা পৃথিবী ও তার সমস্ত সম্পদের মালিকানা গুটিকয়েক মানুষের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়। ৫০ বছর আগে বলা ভিয়েতনাম গণহত্যার নায়ক হেনরি কিসিঙ্গারের কুখ্যাত কথাটি মনে পড়ে যায় — 'যারা খাদ্যের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে তারা মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যারা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গোটা মহাদেশ। আর যাদের হাতে টাকার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম গোটা পৃথিবীটাকেই'। এই দম্ভোক্তির মধ্য দিয়ে তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের বার্তাই গর্বের সাথে দিয়েছিলেন— যে আধিপত্যের ভয়ানক চেহারা আমরা সর্বত্র দেখছি।

মোদির বাংলাদেশ সফর ও তিস্তাচুক্তি প্রসঙ্গে বাসদ (মার্কসবাদী)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর উপলক্ষে ৪ জুন এক বিবৃতিতে পার্টির সকল শাখা সংগঠন, সকল স্তরের নেতা-কর্মী ও জনগণের প্রতি দেশের স্বার্থের পক্ষে সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে আসছেন। এ সফরে মোদি ভারতের একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের স্বার্থে 'কানেকটিভিটি', বিনা শুল্কে ভারতের ২৩টি পণ্যের বাংলাদেশে প্রবেশ, ভারতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ করিডোর, বাংলাদেশের সমুদ্রে সম্পদ আহরণ (ব্লু ইকনমি), বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব আরও পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

বাস্তবে এসব চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সংকট তৈরি হবে যা আগামী দিনে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করবেন। এ অবস্থায় প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব সরকারের এসব আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক ন্যায্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে তিস্তা-পদ্মা সহ সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর জলের ন্যায্য ভাগের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ভারত গোটা বাংলাদেশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং ১৬ কোটি মানুষের মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। সীমান্ত হত্যা নিয়ে বহু আলোচনা সত্ত্বেও তা অব্যাহত আছে। এসব সমস্যার সমাধান না করে মোদির সফরকে ঘিরে আওয়ামি মহাজোট সরকারের উচ্ছ্বাস আসলে ডামাডোলের আড়ালে জনগণের অধিকার হরণেরই প্রক্রিয়া মাত্র। বিবৃতিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁদের শাসকদের নতজানু নীতি এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ সংগঠিত করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হরিয়ানায় বিশাল আন্দোলন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নানা দাবি সহ শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিতে ৬ জুন হরিয়ানার কর্ণলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে জে পি এ অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া অঙ্গনওয়াড়ি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন সহ সংযুক্ত কর্মচারী মঞ্চের সদস্যরা। পুলিশি বাধা অগ্রাহ্য করে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাস্তা মেরামতের দাবিতে ঝাড়খন্ডে আন্দোলন

বিধানসভায় কমরেড তরুণ নস্কর

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন বিল, ২০১৫

১৮ মে ঃ এই বিল আমাকে বিস্মিত করেছে, কারণ বর্তমান সরকার শিক্ষার স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করেছিল এই উচ্চ শিক্ষা সংসদ বিলের মধ্য দিয়ে তার থেকে অনেক দূরে সরে গেল। এই বিলের ফলে উচ্চ শিক্ষার উপর সরকারের রাজনৈতিক ও ব্যুরোক্রেটিক নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হল। যদিও এই সরকারের থেকে কীই বা প্রত্যাশা করা যেতে পারে যখন এই কয়েকদিন আগেই মন্ত্রী বলেছিলেন, টাকা যখন দিই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাক গলাবই? একজন শাসক দলের সদস্য বলেছেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নেই, তাই কাউন্সিলের চেয়ারে মন্ত্রীর বসা দরকার। মন্ত্রীর চেয়ারে বসে যদি না পারেন তা হলে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়ে তিনি তাই পারবেন! মাননীয় সদস্যকে বলি, উনি তা হলে মন্ত্রীকে কলেজে অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করার জন্য সরকারকে বিল আনতে বলুন।

বর্তমান বিল অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে যদি মনিটর করা হয় তা হলে স্বশাসনের আর কী অবশিষ্ট থাকবে? আর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের নামে এই কাউন্সিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজেও হস্তক্ষেপ করবে। এরপরেও স্বাধিকার থাকবে? 'পাওয়ার অফ দি কাউন্সিল' হিসাবে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশে জোর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর 'কমন এন্ট্রান্স এগজামিনেশন' চাপিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার যোগ্যতার মাপকাঠিও রাজ্য সরকার ঠিক করে দেবে। এমনকী কত শতাংশ আসন এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাও রাজ্য সরকার বলে দেবে। তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কী রইল? নানা 'অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটি' সংক্রান্ত বিষয়ে এই কাউন্সিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেবে। যে কাউন্সিলের মাথায় আছেন মন্ত্রী তার অ্যাডভাইস আসলে অর্ডার ছাড়া আর কী হতে পারে?

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের (রুসা) সুপারিশের অজুহাত সরকার দিয়েছে। কিন্তু 'রুসা' কেবল উচ্চশিক্ষা সংসদ গঠনের কথা বলেছে, কোথাও তার চেয়ারম্যান হিসাবে মন্ত্রীকে বসানোর কথা বলেনি। কিন্তু 'রুসা' শিক্ষার স্বাধিকারের উপর জোর দিয়েছে। অথচ রাজ্য সরকার ঠিক উল্টো কাজই করছে। আমি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি।

কৃষি দপ্তরের বাজেট

১ জুন ঃ এই দপ্তরের বাজেট প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা বলতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার আগে প্রথম নির্বাচনী ইশতাহারে বলেছিল — 'কৃষি আমাদের প্রেরণা'। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা ক্ষমতায় এসেছিল। কৃষি যাদের প্রেরণা তারা কৃষি দপ্তরের উপর গুরুত্ব দেবে অনেক, এটাই স্বাভাবিক। অথচ দেখা যাচ্ছে ৪ বছরে ৪ জন মন্ত্রী। কাজের কাজ কী হচ্ছে? ধান আর আলু চাষিদের ১৩৩ জন দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করল, তাঁদের সম্পর্কে কোনও দুঃখ প্রকাশ কৃষিমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে পাওয়া গেল কি? বরং অনেক কষ্ট করে অফিসারদের নিয়ে নানা মিথ্যা কথা বলিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে কেউই দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেননি। এক অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত রাজ্যে আমরা বাস করছি, যেখানে ফলন বেশি হলে চাষি সুখে থাকে না, গলায় দড়ি দিয়ে অথবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। আর মন্ত্রী তা ঢাকা দেওয়ার জন্য নানা অসত্য কথা বলতে থাকেন। মন্ত্রী বলেছেন, তিনি নাকি দালালদের হাত থেকে চাষিদের বাঁচাবেন। দালাল কোথায়, বড় বড় সিন্ডিকেটের হাত থেকে চাষিদের বাঁচাতে হবে, যারা বোম্বেতে বসে আছে। সেখান থেকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এই সরকার খুচরো বাজারকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আইন করেছে। ধানের তবু একটা সহায়ক মূল্য আছে, যা চাষি পায় না। কিন্তু আলুর তো তাও নেই। তাই মৃত্যুর মিছিল থেকে আলু চাষিদের বাঁচনো যাবে কী করে? আপনার দায়িত্ব ছিল কৃষি বিপণন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে চাষিরা যাতে ন্যূনমত মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করা।

যেমন ধরুন পাট চাষি, পাট একেবারেই মূলত এই রাজ্যের বিষয় যা শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়। মন্ত্রী কিছু দিন আগে ঘটা করে রাজ্যের পাট-নীতি ঘোষণা করেছেন। পাট চাষিদের বাঁচাতে গেলে মন্ত্রীর শিল্প দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা দরকার।

চাষিদের বাঁচাতে সেচের খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, দরকার চাষিরা যাতে কম দামে বা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পায় তার ব্যবস্থা করা। পাঞ্জাবের মতো কিছু রাজ্য চাষিদের সেচের কাজে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেয়। মন্ত্রী বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা করছেন না কেন? ওদিকে লিজ চাষিদের চাষ নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই সমস্যা সমাধানের কোনও প্রস্তাবও বাজেট ভাষণে নেই। সারের দাম 'আচ্ছে দিন ওয়ালারা' ক্ষমতায় এসে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারই বা সারে ভর্তুকি দিচ্ছে না কেন? কীটনাশকের মান ও দামের কোনও স্থিরতা নেই, এর উপর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে চাষিরা মার খাচ্ছে। রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে কীটনাশক-নীতি প্রণয়ন করা। হিমঘরগুলো বেশিরভাগই বেসরকারি মালিকানাধীন। সেখানে ক্ষুদ্র বা মাঝারি চাষিরা ঢুকতে পায় না। কারণ বড় বড় ব্যবসায়ীরা তা আগে থেকে বুক করে রাখে। ফলে ঐ চাষিরা বাঁচবে কী করে? সিড কর্পোরেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে একটা সংস্থা ছিল যারা চাষিদের সস্তায় বীজ দিত। তার কোনও ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। মন্ত্রীর ভাষণে এ সবের কোনও উল্লেখ নেই।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও গবেষণার কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রী কি জানেন, প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টন জমির 'টপ সয়েল' (মাটির উপরিভাগ) বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ইট ভাটা মালিকদের কাছে, চাষিরা টাকার লোভে তা তুলে দিচ্ছে ঐ মালিকদের হাতে। সমস্ত গ্রামীণ বিধায়করা তা জানেন। মাটির এই অংশেই থাকের জমির 'লিভিং অরগানিজমগুলি যা উর্বরতা দেয়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় মাটি পলিভিত্তিক হওয়ায় এই উর্বরতা অনেক বেশি। মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে এর কোনও উল্লেখ আছে? অথচ তিনি মৃত্তিকা সংরক্ষণ করবেন বলছেন। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না।

পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট

২৯ মে ঃ পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট হতাশ করেছে। মন্ত্রী আগামী বছর নাকি অনেক কাজ করবেন, অথচ গত বছরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা তাঁর এবারের বাজেট প্রায় ৯০০ কোটি টাকা কম। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ঘোষিত নীতি হল, এই প্রকল্পকে তুলে দেওয়া। ফলে বিগত বছরে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা এখনও মজুরি পাননি। তার উপর গোটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতায় এসে পঞ্চায়েত দুর্নীতির তদন্ত করবেন। কিন্তু কোনও তদন্ত হয়নি।

বিপিএল কার্ড এখনও সংশোধিত হল না, আপনারা ক্ষমতায় এসেই যা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দিল্লির উপর দোষ চাপিয়ে দায় সারতে চাইছেন। আসুন না সবাই মিলে দিল্লি যাই এই দাবিতে। তা কি হবে? এখন তো আবার দেখছি দিল্লির সঙ্গে আপনাদের সমঝোতা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

চূড়ান্ত দলবাজি চলছে প্রতিবন্ধী ভাতা, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা নিয়ে। গীতাঞ্জলির টেন্ডার হলেও ৩-৪ বছরেও কাজ হচ্ছে না টাকা না দেওয়ার ফলে। নিম্নমানের মালপত্র দেওয়া হচ্ছে, নেতা-ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টরের একটা অশুভ আঁতাত সর্বত্র কাজ করছে। আবার অন্য দিকে পঞ্চায়েতে কাজের জন্য যে সংখ্যক কর্মী লাগে তাও আপনারা নিয়োগ করছেন না।

'আমার অধিকার' নামে গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ বিলি বণ্টনের দায়িত্ব আপনার দপ্তরের। অথচ শাসক দলের বিধায়ক ছাড়া অন্য কোনও বিধায়কের সুপারিশে সরকার টাকা দিচ্ছে না। আমি মন্ত্রীকে ২২৫ জনের তালিকা জমা দিয়েছিলাম, তার থেকে একটি সুপারিশও আপনারা গ্রহণ করেননি। এদিকে আপনারা প্রায়ই বলেন, উন্নয়নে কোনও দলবাজি হবে না।

স্কুল সিলেবাস পরিবর্তন প্রসঙ্গে

১০ জুন ঃ স্কুল সিলেবাসের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রসারের বিরোধিতা করে ১০ জুন অধ্যাপক তরুণ নস্কর, রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ২০১২ সালে প্রকাশিত 'পাতাবাহার' নামক তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই থেকে দুটি অংশ পড়ে শোনান। সেখানে বলা আছে, একসময় গাছেরাও চলাফেরা করতে পারত এবং একটি মেয়ে সুতো দিয়ে কাঠপিঁপড়ের কোমর বেঁধে রেখেছিল বলে পিঁপড়ের পেট সরু। তিনি বলেন,

এমন অবৈজ্ঞানিক ধারণা যদি শিশু-কিশোরদের দেওয়া হয় তা হলে তাদের মনের বিকাশ কেমন করে হবে? মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীকে দ্রুত সিলেবাস পরিবর্তনের দাবি করছি।

শ্রমদপ্তরের বাজেট প্রসঙ্গে

২৬ মে ঃ শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্টের পরিমাণ নাকি কম। আমরা জানি বিগত কয়েক মাস নৈহাটি, কাঁকিনাড়া, রিলায়েন্স, নফরচাঁদ সহ ১৮টি জুট মিল বন্ধ হয়েছে এবং তার ফলে প্রায় ৬০,০০০ শ্রমিক বিপন্ন। এর জন্য কি শ্রম দিবস নষ্ট হচ্ছে না?

বিড়ি শ্রমিকদের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২১৩ টাকা, কিন্তু তারা পায় ৫০ থেকে বড়জোর ১০০ টাকা। শ্রমিকদের প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মধ্যে আনার কথা বলা আছে। ৩ লক্ষ মোটরভ্যান চালককে নথিভুক্ত করে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আনা হোক। 'ফাউলাই' প্রকল্পে বন্ধ শিল্প শ্রমিকদের জন্য যে ১৫০০ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার পরিমাণ বাড়ানো হোক।

গত ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকে দাবি উঠেছিল, সরকার চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করুক। সেজন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। কিন্তু বাজেট ভাষণে মন্ত্রী তা উল্লেখ করলেন না কেন? এ ছাড়া প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকদের পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব চা বাগানের মালিকদের। তারা তা করছে কি না সরকার কি দেখছে?

চাইল্ড লেবার প্রিভেনশন ও রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু-শ্রমিকদের কাজ করার কথা নয়। কিন্তু এমন শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। পিংলার ঘটনা তো তাই। অথচ মন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমে বললেন, এ রাজ্যে শিশু-শ্রমিক নেই।

বিভিন্ন পেশার মানুষের কাছ থেকে নেওয়া বৃত্তি কর দিয়ে যুবশ্রী প্রকল্পে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা। কিন্তু সেই কর বাবদ কত টাকা সংগ্রহ হচ্ছে এবং এই ভাতা দেওয়ার কাজে তা ব্যবহার হচ্ছে কি না তা কি মন্ত্রী দেখছেন?

বিলম্বিত ও স্বল্প বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

৪ জুন ঃ দিল্লির মৌসম ভবনের রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছর খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তাতে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। রাজ্য কৃষি মন্ত্রীর কাছে আমার দাবি, অগভীর বা গভীর নলকূপের মাধ্যমে বা নদী থেকে সেচের জন্য জল তোলায় যাতে কম খরচে বা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তিনি যেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে করেন।

গোসাবায় অসহায় বিধবাদের সহায়তা দান প্রসঙ্গে

২ জুন ঃ গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী, ছোট মোল্লাখালি, লাহিড়িপুর, সজনেখালি, বালি প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় চার শতাধিক অসহায় বিধবা মহিলা গত ১০ এপ্রিল গোসাবা বিডিও অফিসের সামনে আইন অমান্য করেন। তাঁদের স্বামীরা সুন্দরবনে মাছ বা মধু সংগ্রহে গিয়ে বাঘ-কুমিরের আক্রমণে মারা গেছেন। তাঁরাই ছিলেন অনেকে ক্ষেত্রে ঐ সব পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এই নিঃস্ব বিধবারা বহুদিন ধরে বিধবা ভাতা, বিপিএল কার্ডের দাবি করে আসছেন। গত বছর ফেব্রুয়ারিতেও তাঁরা আইন অমান্য করেছিলেন। মন্ত্রীরা লোকসভা ভোটের আগে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন।

এই পরিবারগুলির তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের জন্য গৃহনির্মাণ, শিশুদের পড়াশোনা ও কাজের ব্যবস্থা করার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি করছি।

কারও কারও আচ্ছে দিন তো বটেই

মোদি সরকারের এক বছর উপলক্ষে খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তে, নিবন্ধে, টিভি চ্যানেলগুলির বিশেষজ্ঞ মতামতে সমালোচনা শোনা যাচ্ছে— 'আচ্ছে দিন' নাকি আসেনি। কাদের জীবনে আচ্ছে দিনের কথা বলছে তারা? দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতি-মুনাফাখোর, যারা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির পিছনে খরচ করেছিল, দেশের মানুষের কাছে পরিত্রাতা হিসাবে মোদিকে তুলে ধরেছিল, তাদের জীবনে তো আচ্ছে দিন এসেছে। গত এক বছরে মোদি সরকার কী না করেছে তাদের জন্য! তারা যাতে অবাধে মুনাফা করতে পারে, দেশের সমস্ত সম্পদ নির্বিচারে লুঠ করতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থাই তো করে দিয়েছে। অর্থনীতি এবং শিল্পের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে— প্রতিরক্ষা, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, খনি, পরিকাঠামো, নির্মাণ, আবাসন সবকিছুকে দেশীয় পুঁজিপতিদের জন্য তো বটেই, বিদেশি পুঁজির জন্যও খুলে দিয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের এই লুঠতরাজকে আইনসিদ্ধ করতে পুরনো আইন বদলে দিয়ে নতুন আইন পাশ করিয়েছে। ঘোষণা করেছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতি। যাতে বিদেশি পুঁজিপতিদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এ দেশে এসে পুঁজি বিনিয়োগ কর, উৎপাদন কর। উৎপাদিত পণ্য এ দেশে এবং বিদেশের বাজারে বিক্রি কর। তাদের অবাধ মুনাফার জন্য পরিবেশ আইন, শ্রম আইন সব বদলে ফেলা হচ্ছে। যাতে তারা দেশীয় শ্রমিকদের সস্তায় এবং যেমন করে খুশি খাটাতে পারে, যখন খুশি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, প্রতিবাদে যাতে তারা ধর্মঘট করতে না পারে, নতুন করে তেমনই শ্রম আইন তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এর জন্য সস্তায় জমি পাবে, কর কাঠামো বদলে দেব যাতে কর কম দিতে হয় কিংবা একেবারেই না দিতে হয়। ইতিমধ্যেই সরকার বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে 'ন্যূনতম বিকল্প কর' হিসাবে প্রাপ্য চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ছেড়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অর্ধেক হয়ে গেলেও রিলায়েন্স, এসার প্রভৃতি তেল কোম্পানিগুলিকে সীমাহীন মুনাফা পাইয়ে দিতে, জনগণকে শুষে সরকারি রাজস্ব বাড়াতে দেশের বাজারে তেলের দাম কমিয়েছে নামমাত্র। ধান-পাট-আলু-আখ-তুলো চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে যখন হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করছে, তখন ফড়ে, ব্যবসায়ী, হিমঘরের মালিক, চিনিকলের মালিক, সুতাকলের মালিকদের মুনাফা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। চাষিদের ঋণ মকুব, সুদে ছাড় না হলেও শিল্পপতিদের যে পরিমাণ ছাড় দেওয়া হচ্ছে তা গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৬৮ কোটি টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরেই এক লক্ষ দু'হাজার ৬০৬ কোটি টাকা। সম্প্রতি চিনি কলের মালিকদের পাইয়ে দিতে সরকার যা করেছে তাকে নির্লজ্জ মালিক-তোষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। গত কয়েক বছরে চিনির দাম দ্বিগুণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও চিনি কলের মালিকরা চাষিদের আখের দামে ২১ হাজার কোটি টাকা বাকি রেখেছে। সম্প্রতি মোদি সরকার চিনি কল মালিকদের বিনা সুদে ৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, যা থেকে তারা চাষিদের কিছু পরিমাণ ধার মেটাবে। একদিকে চাষিদের থেকে বিনা খরচে আখ নিচ্ছে, আবার সরকারের থেকেও বিনা সুদে ঋণ জুটছে। এ যদি মালিকদের সুখের রাজত্ব না হয়, তবে আর সুখের রাজত্ব কাকে বলে! কিন্তু চাষিদের পাওনা বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা কে মেটাবে? সরকার তার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে? আসলে এর পিছনে শক্তিশালী 'চিনি লবি' কাজ করছে, সরকারের মধ্যে যাদের প্রভাব খুবই সক্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে বাজাজ, বিড়লা, মোদি গোষ্ঠী এবং মদ উৎপাদকদের অন্যতম শিরোমণি পন্টি চাড্ডার মালিকানাধীন ওয়েভ গোষ্ঠী প্রমুখ। ফলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেশের এক শতাংশ পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের জীবনে আচ্ছে দিন এসেছে। দেশের শিল্পপতিদের সংগঠনগুলি, সি আই আই, ফিকি, অ্যাসোচেম সকলেই তা খোলাখুলি স্বীকারও করছে। আই এম এফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারের 'সংস্কার' কাজের প্রশংসা করছে। আই এম এফ প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্দ ভারতকে 'বৃদ্ধির উজ্জ্বল জায়গা' বলে বর্ণনা করেছেন। মুডিজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলিও ভারত সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ক্রমশ আশাব্যাঞ্জক হিসাবে দেখাচ্ছে।

দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে অবশ্য আচ্ছে দিনের কোনও ছোঁয়া নেই। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। দেশের বিরাট অংশের মানুষের জীবনে অর্ধাহার অনাহার আর হাহাকার নিত্যসঙ্গী। মোদি সরকার গত এক বছরে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। নতুন কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা নেই। বেকারি বাড়ছে হু হু করে। বেকার যুবকের দল কাজের খোঁজে এ-দেশ ও-দেশে ছুটে বেড়াচ্ছে। চাষির আত্মহত্যার ঘটনা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু মোদি সরকারের নতুন জমি-আইন চাষিদের মধ্যে জমি-হারানোর আতঙ্ক তৈরি করেছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কারখানা বন্ধ হচ্ছে— ছাঁটাই শ্রমিকের সপরিবারে আত্মহত্যার ঘটনা আকছার ঘটছে। মহিলাদের উপর নির্যাতন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণের ঘটনা কমা দূরের কথা, বেড়েই চলেছে। ভাড়া বেড়েছে রেলের। দাম বেড়েছে সব রকমের ওষুধের। দেশের ৯৯ ভাগ সাধারণ মানুষের জীবনে আচ্ছে দিন দূরের কথা, দুর্ভোগই আরও বেড়েছে।

তা হলে সংবাদমাধ্যমে কাদের আচ্ছে দিনের জন্য এমন হাহাকার? পুঁজিপতি শ্রেণির পরিচালিত এই সংবাদমাধ্যমের দুশ্চিন্তা তো সাধারণ মানুষের আচ্ছে দিনের জন্য হওয়ার কথা নয়। কেন তাদের এই দুরবস্থা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কেন তাদের পেটের খিদে মেটে না, কেন তাদের সন্তানরা বিনা চিকিৎসায় মরে, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকে, কারা এর জন্য দায়ী, এই দুঃসহ অবস্থার অবসান কোন পথে— এসব নিয়ে গভীর ভাবে সত্য খুঁজতে তাদের কখনও দেখা যায় না। তাদের খোঁজার কথাও নয়। সাধারণ মানুষের কথা যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই খবর হিসাবে তারা বলে। গজেন্দ্র সিংয়ের মতো কেউ যখন গলায় ফাঁস লাগিয়ে প্রকাশ্যে ঝুলে পড়ে, তখন খবরের কাগজে তার ফলাও ছবি বেরোয়, চ্যানেলে চ্যানেলে লাইভ কভারেজ দেয়, কিন্তু তাদের দুর্ভোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের উদ্বেগ চোখে পড়ে না। ফলে সংবাদমাধ্যমের এত কাঁদুনি সাধারণ মানুষের আচ্ছে দিন আসেনি বলে নয়।

বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এবং তাদেরই বেতনভুক বিশেষজ্ঞদের কাঁদুনি বৃহৎপুঁজির স্বার্থেই। তাদের দাবি, ঝড়ের বেগে 'সংস্কারের' কাজ চালাক মোদি সরকার। প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করুক। এক পা এক পা করে এগোনো তাদের পছন্দ নয়। তারা চাইছে আরও দ্রুত সংস্কার, আরও বেসরকারিকরণ, আরও কর ছাড়, আরও বেপরোয়া মনোভাব। কারণ প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বান, দেদার ছাড় ঘোষণা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো বিদেশি বিনিয়োগ কিছু আসেনি। বিশ্বজুড়ে মন্দা কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং তা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। বিনিয়োগ যতটুকু আসছে, তা শেয়ার বাজারেই, শিল্পে বিনিয়োগ এখনও উল্লেখ করার মতো নেই। দেশীয় বাজারে শিল্পোৎপাদনের হার টানা ঋণাত্মক চলছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বাজারের অবস্থাও খুবই খারাপ। মালিকদের মুনাফায় টান পড়ছে। অন্য দিকে সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমনীতিতে, কৃষক স্বার্থবিরোধী জমিনীতিতে, বেআব্রু মালিক তোষণ নীতিতে দেশ জুড়ে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এখানে ওখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। সরকার যাতে সে সবে ভয় পেয়ে সংস্কারের গতি ধীর না করে দেয়, তার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেই 'আচ্ছে দিন' ঠিকমতো আসেনি বলে এই প্রচার চালানো হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের সমালোচনার ধরনটি খেয়াল করলেই তা ধরা পড়বে। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক তাদের সম্পাদকীয়তে লিখছে, 'পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু যতখানি প্রয়োজন, যত দ্রুত প্রয়োজন, ততখানি হয়নি।' ওই গোষ্ঠীর একটি বাংলা কাগজ লিখছে, 'প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের ফারাকটি এখনও দূর হয়নি। কারণ, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংস্কারের শ্লথ গতি'। প্রথম সারির দাবিদার একটি বাংলা দৈনিক লিখছে, 'ভারত যে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের অপেক্ষায় আছে, নরেন্দ্র মোদি গত এক বৎসরে সেই পথে হাঁটিতে পারে নাই। অরুণ জেটলি বিপুল বিলগ্নিকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। খুচরা বিপণনে বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমার প্রশ্নে অহেতুক বিতর্ক তৈরি হইয়াছে'। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী এই মহল চায়, সরকার সংস্কারের রথ বিপুল গতিতে ছোটাক, তার তলায় কোন রামা কৈবর্ত চাপা পড়বে, ধাক্কায় কোন রহিম শেখ ছিটকে পড়বে তা দেখার দরকার নেই। মালিক শ্রেণির মুনাফা যেন আরও বাড়তেই থাকে। এই হল পুঁজিবাদের স্বরূপ। মুনাফার স্বার্থ ছাড়া তারা আর কিছু বোঝে না— সমাজ সভ্যতা মনুষ্যত্ব, কোনও কিছুরই কোনও মূল্য নেই তাদের কাছে।

কিন্তু তারা ভাবছে, দেশটা বোধহয় শুধু পুঁজিপতিদের আর মুনাফাখোরদেরই। তারা যেমন খুশি দেশটাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, দেশের জল-জমি-জঙ্গল-খনি-নদী-কলকারখানা সব কিছু অবাধে লুঠ করবে, মুনাফায় তাদের ব্যাঙ্কের ব্যালান্স ফুলতে ফুলতে ক্রমে আকাশ ছোঁবে। একেই তারা নাম দিয়েছে 'উন্নয়ন'। বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষ তাদের ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণের বিনিময়ে তাদের সেই উন্নয়নের রথের চাকাকে সচল রাখবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে তাদের এমনই চুক্তি ছিল। নির্বাচনে তাঁর পিছনে বিপুল অঙ্কের টাকা ঢালা তাদের এই জন্যই। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি যতই নিজেকে একশো পঁচিশ কোটি জনগণের ঈশ্বর বলে মনে করুন, সত্যিই তো আর তা নয়। তাই পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ঘৃণা বাড়ছে, ক্ষোভ বাড়ছে। মোদি সরকারের জমি বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভ উঠেছে। শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। শ্রমিকরা ডাক দিয়েছে সাধারণ ধর্মঘটের। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের থেকে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে সারা দেশের ছাত্ররা ডাক দিয়েছে দেশজোড়া ছাত্রধর্মঘটের। এক শতাংশের শোষণ-অত্যাচার-লুঠতরাজের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৯৯ শতাংশ।

রায়গঞ্জ কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে ভর্তি সমস্যার সমাধানের দাবি

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে পরিকাঠামোহীন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে এবং কলেজ থেকে পাশ কোর্স তুলে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এর ফলে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করা বহু ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে ইতি ঘটতে চলেছে। এই সমস্যার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে এ আই ডি এস ও। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১ জুন জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক ডেপুটেশন গ্রহণ করে তাদের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে সেগুলি সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাঁকুড়ায় গৃহবধূ খুন, আন্দোলনের চাপে দোষীরা গ্রেপ্তার

বাঁকুড়ার রাইপুরে গৃহবধূ মিঠু দুলের দেহ থানার অদূরে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় গত ২৭ মে। দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে অল ইন্ডিয়া এম এস এসের পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষ ও বাড়ির লোকজনকে নিয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে চলতে থাকে লাগাতার আন্দোলন। অবশেষে স্থানীয় মানুষ অভিযুক্ত ৩ জনকে ধরে থানায় নিয়ে এলে ও সি তাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়, পরে আরও ২ জন গ্রেপ্তার হয়।

স্থানীয় মানুষ আন্দোলনের এই জয়ে উপলব্ধি করেছেন, সংগঠিত না হলে নিরাপত্তা থাকবে না। সংগঠিত আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র রাস্তা। তাই পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বহু মানুষের উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে 'নাগরিক কমিটি'। এই সভায় এ আই এম এস এসের জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহারে গণধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

হলদিবাড়ি ব্লকের খালপাড়া গ্রামের এক গৃহবধূকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ২৪ মে এ আই এম এস এসের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং হলদিবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি, মদ-জুয়ার আড্ডা বন্ধ করা এবং প্রচারমাধ্যমে অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবিতে গোটা এলাকায় ব্যাপক স্বাক্ষর সংগ্রহ চলে।

বজবজে আশা কর্মীদের সম্মেলন

২ জুন আশা কর্মী ইউনিয়নের বজবজ ২নং ব্লকের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আশাকর্মীরা তাঁদের জীবনের দুর্দশার বিবরণ দেন এবং কাজের নিরাপত্তা, ফরম্যাট প্রথা বাতিল, সাইকেল-মোবাইল ইত্যাদির দাবি তুলে ধরেন। সম্মেলনে ১০ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অজয় ঘোষ। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য পিন্টু দাস।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

বিধানসভার গেটে আছড়ে পড়ল চিটফান্ড প্রতারিতদের বিক্ষোভ

আমানতকারীদের টাকা ফেরত, কেলেঙ্কারিতে যুক্ত সকলের শাস্তি সহ নানা দাবিতে অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরামের পক্ষ থেকে ১২ জুন বিধানসভা চলাকালীন তার সব গেটে বিক্ষোভ দেখাল সহস্রাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট। প্রায় চল্লিশ মিনিট অবরোধ চলার পর পুলিশ দেড় শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে শহিদ মিনার থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল শেষে সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন রূপম চৌধুরী, বিশ্বজিৎ সাঁপুই, অশোকতরু প্রধান, বাপ্পাদিত্য হালদার, বিশ্বজিৎ পুরকাইত, আসরাফুল হক (জুয়েল), চন্দনা সরকার, শ্রীকৃষ্ণ নস্কর প্রমুখ।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে শিশু মৃত্যুতে বিক্ষোভ

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে ৪৮ ঘন্টায় ১১টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় ১৩ জুন এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চিকিৎসায় গাফিলতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে এবং শিশুমৃত্যু রোধে পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড হরলাল মাহাত। বিক্ষোভে বহু রোগীর পরিজন ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ছত্তিশগড়ে তিন হাজার স্কুল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ডি এস ও-র আন্দোলন

এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একের বেশি প্রাইমারি স্কুল থাকলে তা তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু দু'পা অন্তর মদের দোকান খোলা যাবে।

শুধু প্রাইমারি স্কুল নয়, ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার তিন কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক মিডল স্কুল, পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থাকলে সেগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। এভাবে রাজ্যের প্রায় তিন হাজার স্কুল তুলে দেওয়া হচ্ছে। অজুহাত, এতে সরকারের রাজস্ব বাঁচবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ফিল্ম সিটি ইত্যাদি নির্মাণে সরকারি বরাদ্দে কার্পণ্য নেই। ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র প্রশ্ন, রাজস্ব তো আসে জনগণের ট্যাক্স থেকে, তাহলে তা জনস্বার্থে খরচ না করে অন্য খাতে বরাদ্দ হবে কেন? উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার স্কুল ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার ফরমান জারি করেছে, মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার সাড়ে তিন হাজার স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এভাবে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা ভারত ডি এস ও-র ছত্তিশগড় রাজ্য কমিটি ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধ বাস পরিষেবা অবিলম্বে চালুর দাবিতে নন্দীগ্রামে পথ অবরোধ

গত এক সপ্তাহ ধরে নন্দীগ্রাম রুটের প্রায় সমস্ত বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ। হাজার হাজার যাত্রী হয়রান হচ্ছেন। এ ছাড়াও নন্দীগ্রামের হাজার হাজার দর্জি কারিগর কলকাতা সহ রাজ্যের

অন্যান্য জায়গায় কাজের জন্য যাতায়াত করেন। তাঁরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। কয়েকটি সরকারি বাস চললেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই অবস্থায় নন্দীগ্রাম রুটের সমস্ত বাস পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ জুন নন্দীগ্রাম থানা মোড়ে অবরোধ করা হয়। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মনোজ দাস, অসিত প্রধান, বিমল মাইতি প্রমুখ।

মদের দোকান খোলার বিধিনিষেধ শিথিল করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৮ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

'মদের দোকান খোলার বিধিনিষেধ শিথিল করে ও পাইকারি মদ ব্যবসায়ীদের খুচরো মদ বিক্রির লাইসেন্স দিয়ে চলতি আর্থিক বছরে ৪,৪১৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সংকট জর্জরিত অসহায় মানুষকে অবক্ষয়ের অন্ধকারে ঠেলে রাজস্ব আদায়ের এই ঘৃণ্য পথ অবলম্বনকে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে না। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করছি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।'

চটকল সংকট
অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, চটকল মালিকদের শ্রমস্বার্থবিরোধী নীতির ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি চটকল বন্ধ এবং কার্যত কর্মহীন চটকল শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে কর্মহীন চটকল শ্রমিক পরিবারগুলি চরম দুর্দশার মুখোমুখি। যে চটকলগুলি চালু আছে, মালিকরা সেখানে শিফটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। ফলে বর্তমানে প্রায় লক্ষাধিক চটকল শ্রমিক কর্মহীন। চটকল শ্রমিকদের এই দুরবস্থার ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক। সেইসাথে কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত একের পর এক শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতিই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী।

চটকলের বর্তমান সংকটজনক অবস্থা নিরসনে অবিলম্বে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কাছে ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। বিনা শর্তে চটকল মালিকদের অমানবিক সাসপেনশন অব ওয়ার্ক প্রত্যাহার করে সকল শ্রমিকদের নিয়ে বন্ধ চটকলগুলি পুনরায় চালু করার দাবিও আমরা করছি। আমরা সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, বিশেষ করে চটকলের সকল ইউনিয়নের কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে মালিকদের এই আক্রমণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন।

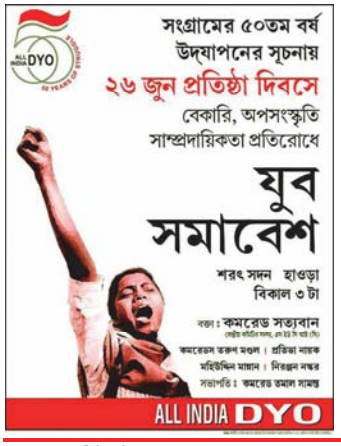

জবলপুরে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

মধ্যপ্রদেশের এক লাখ বাইশ হাজার স্কুলের বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা, ছাত্রছাত্রীদের রোবটে পরিণত করা বন্ধ করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করার দাবিতে ২৯ মে জবলপুরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in